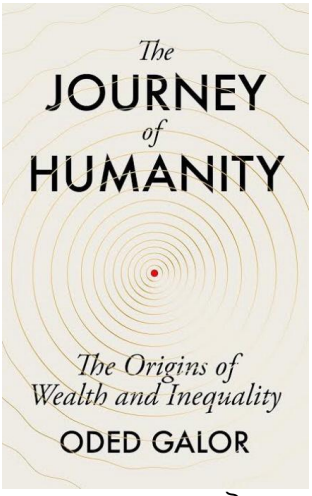

দ্য জার্নি অফ হিউম্যানিটি: দ্য ওরিজিনস অফ ওয়েল্থ অ্যান্ড ইনিকুয়ালিটি/ ওদেদ গ্যালোর (পেঙ্গুইন)

বৈভব আর বৈষম্যের উৎস সন্ধানে

পরন্তপ বসু

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট একটি দ্বীপ তান্নাতে একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল। যুদ্ধের পরে সব সৈনিকরা যখন পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেল, তান্নাবাসিরা সেই যুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে দিনযাপন করতেন। প্রতিদিন শূন্য বিমানবন্দরে কাঠের খেলনা বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে মার্চ করে বেড়াতেন এই আশায় যে, যুদ্ধের সময়ে দ্বীপে যে প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি এসেছিল, কোন দৈববলে হয়তো সেগুলি আবার ফিরে আসবে। এই দ্বীপবাসিদের কাছে যুদ্ধ ব্যাপারটি ছিল একটি অলৌকিক অভিজ্ঞতা। ওদেদ গ্যালোর তাঁর নতুন বই 'দ্য জার্নি অফ হিউম্যানিটি'-তে এই ঘটনাটির উল্লেখ করে বলছেন যে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের উন্নয়নের প্রকল্পগুলি, অনুন্নত দেশের জনসাধারণের কাছে তান্নাদ্বীপের মানুষের অভিজ্ঞতার মতোই অলীক আর অবাস্তব। কেন অবাস্তব তার উৎস সন্ধানে গ্যালোর প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যান। বিশ্লেষণ করেন মানবজাতির দীর্ঘ পথ চলা, অর্থনৈতিক স্থবিরতা থেকে সমৃদ্ধির পথ ধরে আজকের অসাম্যের চূড়ায় পৌঁছনো।

গ্যালোর তাঁর তত্ত্বে সব সভ্যতার আকর ও সূচনাবিন্দু করেছেন আফ্রিকাকে। তিনি বলছেন, বিভিন্ন সভ্যতা আফ্রিকার থেকে যত দূরে গড়ে উঠেছে, ততই তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র হ্রাস পেয়েছে। তিনশো হাজার বছর আগে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত আফ্রিকায়। মৃত্যু ছিল তাদের প্রতিদিনের দোসর। প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করতে করতে, তারা জীবন ধারণের নানা প্রকার কৌশল, শিকার করার নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিজেরাই আবিষ্কার করল। যে সময়ের কথা গ্যালোর বলছেন সেটি হিমবাহের যুগ। তারপর প্রকৃতিতে উষ্ণতা এলো আজ থেকে প্রায় হাজার বারো বছর আগে। এই উষ্ণতা হোমো স্যাপিয়েন্স শিকারি সংগ্রাহকদের জীবনে একটি আমূল পরিবর্তন নিয়ে এলো। তারা থিতু হলো। চাষ করতে শিখল। কৃষিভিত্তিক সমাজে মানুষ যেই স্থায়িত্ব অর্জন করল তাদের উৎপাদন বাড়ল, তারা নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে শিখল। জ্যারেট ডায়মন্ডের পথ অনুসরণ করে গ্যালোর বলছেন আধুনিক মানব সভ্যতাকে বুঝতে হলে এই কৃষিসমাজকে বুঝতে হবে।

মানব সভ্যতার এই যাত্রা কিন্তু এখানেই স্তব্ধ হলো না। মানুষ যখনই কৃষির উৎপাদন বাড়াল নানা রকম প্রযুক্তি দিয়ে, সন্তান উৎপাদনও বাড়তে থাকল তার থেকে বেশি হারে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে মৃত্যুর হার কমলো। জন্মের হারের বৃদ্ধি আর মৃত্যুর হারের হ্রাসে জনসংখ্যা বাড়ল, মাথাপিছু আয় কমলো। ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী ঠিক এরকমটিই হওয়ার কথা। এর ফলে জীবনযাত্রার মান কিন্তু বাড়ল না। ম্যালথাসের তত্ত্ব যে কত শক্তিশালী তা প্রমাণিত হয় যখন আমরা দেখি ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের জীবন ধারণের মানের কোন উন্নতি ঘটেনি যদিও কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে।

এরপর এলো অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব- স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কার। তারপরেই মানব সভ্যতায় কতগুলি আমূল পরিবর্তন এলো। মানুষ বুঝতে শিখলো যে শুধু সন্তান উৎপাদন করে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব নয়। সন্তানদের শিক্ষিত করতে হবে। উৎপাদনের উপাদান শুধু স্টিম ইঞ্জিন আর যন্ত্রপাতি নয়, মানবসম্পদও যাকে অর্থনীতিবিদরা বলেন হিউম্যান ক্যাপিটাল। উনিশ শতকের মধ্য থেকে শিশুশ্রমের ব্যবহার হ্রাস পেল। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হলো। কাজে মননশীলতার প্রয়োগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারী, পুরুষের মজুরীর ফারাকও কমতে শুরু করল। মহিলারা যত কর্মস্থলে আসতে লাগলেন, সন্তান জন্মের হারও তত কমে এলো। উনিশ শতকের শেষ থেকে পৃথিবীতে জীবনধারণের মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলো। মাথা পিছু আয় অন্তত পক্ষে ১৪ গুণ বাড়ল। ম্যালথাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের অবসান হলো। পৃথিবীতে বৈভব আর সমৃদ্ধির জোয়ার এলো।

তবে তখন থেকেই নতুন একটি সমস্যার সম্মুখীন হলো এই বিশ্ব, যা হলো চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বৈষম্য! পশ্চিম ইউরোপ আর আমেরিকার জীবনযাত্রার মান উন্নত হলো ঠিকই কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার অনেক দেশ অনুন্নতই রয়ে গেল। প্রতিটি দেশের আভ্যন্তরীণ সমাজেও অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়লো। প্রশ্ন হলো, এই বৈষম্যের উৎস কোথায়?

গ্যালোর বলছেন উন্নত দেশের মানুষদের মন হয়তো বৃদ্ধিনির্ভর, ফলে খানিকটা দূরদর্শীও বটে, যা অনুন্নত দেশে বিরল। কিন্তু কেন এই দূরদর্শিতার অসাম্য! আমরা তো সকলেই রক্তমাংসের মানুষ। মনগুলো তাহলে এত আলাদা কেন? এর উত্তর খুঁজতে গ্যালোর ভূগোলে চলে যান। কিছু কিছু দেশের চাষের জমি হয়তো বিভিন্ন ফসল ফলানোর উপযোগী আবার কোন দেশের জমিতে হয়তো চা বা কফি ছাড়া আর কিছুই ফলানো যায় না তেমন। যে দেশের জমিতে বিভিন্ন রকমের ফসল ফলে সেখানে মানুষের আচরণ অনেক বেশি বাজার ও বৃদ্ধি কেন্দ্রিক হয়ে গেল। যেখানে চা কফি ছাড়া আর কিছু উৎপাদন হয় না সেই দেশগুলি অনুন্নত হয়েই রইল দাসপ্রথার ইতিহাসকে জিইয়ে রেখে। আবার যেসব জমিতে লাঙলের ব্যবহার বেশি, কায়িক শক্তির কারণে, সেই দেশগুলি পুরুষকেন্দ্রিক লিঙ্গবৈষম্যের সমাজে রূপান্তরিত হলো।

গ্যালোর আরও বলছেন উন্নতির আসলে কোন বাধাধরা গৎ নেই। বিভিন্ন দেশের তন্ত্রী বিভিন্ন সুরে বাজে। কী সুরে বাজবে, তার পিছনে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা রয়েছে। কোন কোন দেশের অগ্রগতির জন্য সংস্কৃতির বৈচিত্র খুবই অনুকূল, বিশেষত যখন বিভিন্ন সৃজনী শক্তির মিলনে প্রযুক্তির উৎকর্ষ বাড়ে। আবার কোনো কোনো দেশে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ যখন নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস হারিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তা উন্নয়নের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বিশ্বব্যাঙ্কের সংস্কারের বাঁধাগতের দাওয়াই অনেক অনুন্নত দেশের অগণিত মানুষের কাছে তান্নাবাসীদের উপলব্ধির মতনই অবাস্তব ও অলীক।

পৃথিবী আজ এক ভয়ানক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে প্রযুক্তি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানকে প্রতিনিয়ত উন্নীত করছে। অন্যদিকে সেই প্রযুক্তি পরিবেশ দূষণ করে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জীবন বিপন্ন করছে। যেভাবে শিল্পবিপ্লবের পর মানবসম্পদের বিকাশ আমাদের ম্যালথাসের অন্ধকার পথ পার করে দিয়েছিল, সেই একই মানবসম্পদের ওপর ভরসা রেখে আশা করি আমরা এই দুর্দিনগুলিও অতিক্রম করব। গ্যালোর এই বিষয়ে আশার প্রদীপশিখাই জ্বালাচ্ছেন শেষ পরিচ্ছেদে, বলছেন শিক্ষার প্রসারের কথা। বিশ্বব্যাঙ্কও প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু কী ধরণের শিক্ষা একটি দেশের পক্ষে উপযোগী হবে সে বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে কিছু বলছে না। গ্যালোর বলছেন একটি দেশের শিক্ষার পাঠক্রমের সঙ্গে সেই দেশের সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক পটভূমির সাযুজ্য থাকা প্রয়োজন। বইটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি বলছেন যে দেশে অনেক সংস্কৃতির মানুষ বাস করেন, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা বাড়ানোর কথা থাকা উচিত। যে দেশে সংস্কৃতির মধ্যে খুব বৈচিত্র নেই, সেখানে সিলেবাসে চলতি ধ্যানধারণাকে প্রশ্ন করার রসদ থাকা বাঞ্ছনীয়। যে দেশের জমিতে লাঙলের ব্যবহার বেশি, যেখানে পেশীশক্তির কারণে নারী পুরুষে অসাম্য, সেখানে ছাত্রদের সিলেবাসে লিঙ্গসাম্যের প্রাধান্য থাকা দরকার। প্রয়োজন হলো স্থান কাল ভিত্তিক সঠিক শিক্ষার প্রসার যা মানুষের মনের জানালাগুলি খুলে দেবে, ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা বাড়াবে।

গ্যালোর নিজে যদিও বলেছেন তাঁর বইটির মূল প্রতিপাদ্য আন্তর্দেশীয় অসাম্য, তিনি বিভিন্ন দেশের ভেতরের বৈষম্যের বিষয়েও তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। বইটির প্রতি পরিচ্ছেদেই চিন্তার ফসল আছে। তবু প্রশ্ন রয়েই যায় আমাদের ভারতের সম্বন্ধে, যেখানে বৈষম্য ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। যে দেশে শীর্ষের এক শতাংশ মানুষ দেশের বাইশ শতাংশ সম্পদ ভোগ করেন, যে দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ, বিভিন্ন সংস্কৃতি নিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করা সত্ত্বেও অসহিষ্ণুতার বিষ হিংসার বীজ বপন করে চলে, যে দেশে লিঙ্গবৈষম্য, দুর্নীতি দৈনন্দিনের সঙ্গী, কী ধরণের শিক্ষানীতি সেই দেশকে সুখ সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবে? (988 words)

(লেখক ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক)